بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৭ মার্চ, ২০২৬ মোতাবেক ২৭ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিমা ভাঙার বিস্তারিত বিবরণ বিগত খুতবাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবকিছুই তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের ঘোষণার অংশ হিসেবে করেছিলেন; অর্থাৎ এটি বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে-সব মূর্তির উপাসনা করো– এই হলো সেগুলোর (অসার) অবস্থা। আমরা দেখেছি, মক্কার আশেপাশে মুশরিকদের বড়ো বড়ো মূর্তি, যেমন– মানাত, উযযা, সুওয়া ইত্যাদিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তায়েফবাসীদের মূর্তি 'লাত' সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত হলো:

তায়েফবাসীরা তাদের মূর্তি 'লাত' সম্পর্কে– যাকে তারা 'রাব্বা' অর্থাৎ দেবী বলত– তিন বছর পর্যন্ত না ভাঙার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুরোধ জানায়। মহানবী (সা.)-এর তওহীদের জন্য আত্মাভিমান এই কপটতা মেনে নেয় নি। তায়েফবাসীরা পুনরায় নিবেদন করে, অন্তত এক বছরের জন্য যেন তা না ভাঙা হয়। মহানবী (সা.) তা-ও মানতে অস্বীকার করেন। তারা বলে, ঠিক আছে, অন্তত এক মাসের জন্য এটি না ভাঙার অনুমতি দিন, যেন লোকেরা ইসলাম করে নেয় আর নির্বোধ লোক ও নারীরা এটি ভাঙার কারণে আবার ইসলাম থেকে দূরে সরে না যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) এরও অনুমতি দেন নি এবং হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ও হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে পাঠিয়ে সেই মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দেন। তওহীদের প্রতি তাঁর (সা.) আত্মাভিমান– এটি মেনে নিতে পারে নি যে, এই মূর্তিগুলোকে কোনো অবস্থাতেই অবশিষ্ট রাখা হবে, বিশেষ করে যখন কিনা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। **(সীরাতুল্ হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

আবুল হাইয়্যাজ আসাদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আলী বিন আবু তালিব (রা.) আমাকে বলেছিলেন, **আমি কি তোমাকে সেই কাজে অর্থাৎ সেই অভিযানে পাঠাব না, যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো, তুমি কোনো মূর্তি আস্ত রাখবে না, বরং চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে; আর কোনো উঁচু কবর বাদ দেবে না, বরং তা সমান করে দেবে।** **(সহীহ্ মুসলিমের অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৩, কিতাবুল্ জানায়েয, বাবুল আমরি বিতাসভিয়াতিল্ কবর, হাদীস নং: ১৫৯৭, রাবওয়ার নূর ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত)**

কেন? কারণ এগুলো তওহীদের পরিপন্থি বিষয় এবং ইসলামী শাসনাধীন দেশে এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে মুসলমানদের একটি বিশাল অংশ কবরপূজা করে, কবরে সিজদা করে এবং খোদা তা'লার কাছে চাওয়ার পরিবর্তে ওইসব কবরে শায়িত বুযূর্গদের কাছে যাচনা করে আর এক্ষেত্রে তারা চরম বাড়াবাড়ি করে থাকে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.) তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কার পৌত্তলিকদের মতো একটি শক্তিশালী জাতির মোকাবিলা করেছিলেন এবং পরিশেষে পবিত্র কা'বাগৃহকে তিনশ ষাটটি মূর্তি থেকে পবিত্র করেছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি (সা.) ইসলাম গ্রহণকারীদের হৃদয়ে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান ও আশিসময় জিহাদ করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির বদৌলতে তওহীদপ্রেমী একটি জামা'ত গঠন করেছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) এত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে তরবিয়ত করেছেন যেন শিরকের লেশমাত্রও কারো মাথায় দানা না বাঁধে। এ উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত উমর (রা.)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কোরো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা মরিয়মপুত্রের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহ্‌র এক অধম বান্দামাত্র, তাই তোমরা এভাবে বলবে– আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবঃ আহাদীসুল্ আম্বিয়া, বাবঃ কওলুল্লাহি্ তা'লা, ওয়াযকুর ফীল্ কিতাবি মরিয়ম, হাদীস নংঃ ৩৪৪৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উমর বিন খাত্তাব (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি একটি কাফেলার সাথে যাচ্ছিলেন এবং নিজের পিতার নামে শপথ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, **শোনো! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজেদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে বারণ করেছেন। যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমানি ওয়ান্ নুযূর, বাবঃ লা তাহলিফূ বি আবাইকুম, হাদীস নংঃ ৬৬৪৬)

আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের বিপরীতে সামান্যতম কোনো কিছুকে দাঁড় করানো হোক, এটি তাঁর (সা.) কাছে ছিল অসহনীয়।

তওহীদের কলেমা পাঠকারীর মর্যাদা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ হয়েছে: উবায়দুল্লাহ্ বিন আদী বিন খিয়ার বর্ণনা করেন, হযরত মিকদাদ বিন আমর কিনদী (রা.)– যিনি বনু যুহরার মিত্র ছিলেন এবং সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন– তিনি বলেছেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, **আমাকে বলুন, যদি কাফিরদের মধ্য থেকে কারো সাথে আমার মোকাবিলা হয় এবং আমরা উভয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ি, আর সে আমার দুই হাতের মধ্যে এক হাত তরবারির আঘাতে কেটে ফেলে; এরপর গাছের আড়ালে চলে যায়, অর্থাৎ লুকিয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ কথা বলার পর বা কলেমা পড়ার পর তাকে হত্যা করা যাবে কী?** মহানবী (সা.) বলেন, **তুমি তাকে হত্যা কোরো না।** হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সে আমার এক হাত কেটে ফেলেছে এবং তা কাটার পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে।** মহানবী (সা.)

বলেন, **তাকে হত্যা কোরো না। কারণ, তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তবে সে তোমার সেই মর্যাদায় আসীন হয়ে যাবে, যা তাকে হত্যা করার পূর্বে তোমার ছিল; আর তুমি তার সেই অবস্থানে চলে যাবে, যা এই কলেমা পাঠ করার পূর্বে তার ছিল।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব (১২), হাদীস নং: ৪০১৯)

অতএব, যত প্রবীণ সাহাবীই হোন না কেন, তাঁরাও যদি এমন কোনো কাজ করতেন, তবে মহানবী (সা.) তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা দেখুন! পাকিস্তানে আহমদীদের কলেমা পড়া সত্ত্বেও যে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়, তার কোনো সীমা নেই। এই সীমালঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে মহানবী (সা.) এই রেওয়ায়েতে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। এখন যারা এসব চরমপন্থি মৌলবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তাদের এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

এরপর এই প্রসঙ্গেই একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সকাল বেলা আমরা জুহায়নার '*হুরুকাত*'-এ পৌঁছি; *হুরুকাত হলো জুহায়না গোত্রের এলাকার একটি গ্রামের নাম*; সেখানে আমি এক ব্যক্তিকে আটক করি, সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** পাঠ করে, কিন্তু তবুও আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে বসি। এতে আমার মনে এ মর্মে অস্বস্তি বিরাজ করছিল যে, সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** পাঠ করেছিল, তা সত্ত্বেও আমি তাকে হত্যা করলাম! তাই আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট এটি উল্লেখ করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?** আমি নিবেদন করি, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সে তো কেবল অস্ত্রের ভয়ে এ কথা বলেছিল।** তিনি (সা.) বলেন, **তুমি তার বুক চিরে দেখলে না কেন, যাতে তুমি জানতে পারতে, সে অন্তর থেকে এটি বলেছিল কি না?** তিনি (সা.) আমার সামনে এই কথাটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যে কারণে আমার ইচ্ছা হলো, হায়! আমি যদি আজকেই ইসলাম গ্রহণ করতাম! (সহীহ্ মুসলিমের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৮-৮৯, কিতাবুল্ ঈমান, বাবু তাহরীমি কাতলিল কাফিরি বা'দা আন কালা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, হাদীস নং: ১৩২, রাবওয়ার নূর ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত)

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন এসে বলে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! দুটি এমন বিষয় কী যা জান্নাত ও জাহান্নাম অবধারিত করে?** তিনি (সা.) বলেন, **যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে নি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আগুনে প্রবেশ করবে।**

হযরত মাহমুদ বিন লবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত, তা হলো শিরক-এ-আসগর (তথা ছোটো শিরক)।** সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শিরক-এ-আসগর কী?** তিনি (সা.) বলেন, **'রিয়া' তথা লোক দেখানো কাজ। কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাদের আমল বা কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বলবেন, যাদের জন্য তোমরা পৃথিবীতে লোক দেখানো কাজ করতে, তাদের কাছেই যাও এবং দেখো তাদের কাছে তোমরা কোনো প্রতিদান পাও কি না। এখন ক্ষমা**

চাইতে হলে তাদের কাছেই চাও, তারপর দেখো তোমরা কী পাও। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৯৯, হাদীস নংঃ ২৪০৩০, আলেমুল কুতুব, ১৯৯৮ ইং)

কাজেই, মানুষের কাছ থেকে কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে লোক-দেখানো কাজ করা বা তোষামোদ করা আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে কাউকে দাঁড় করানোর মতো বিষয়; আর এটি হলো শিরক, যা আল্লাহ্ তা'লা চরম অপছন্দ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (সূরা আল-আনআম:৮৩)

অর্থাৎ, 'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায় দ্বারা কলুষিত করে নি'– তখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে যুলম বা অন্যায় করে নি? আমাদের অনেকেই এমন আছে, যারা টেরও পাই না, অথচ অন্যায় করে বসি।' তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (সূরা লুকমানঃ ১৪) অর্থাৎ **নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান, যুলমিন দূনা যুলমিন, হাদীস নংঃ ৩২)

তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই উত্তর এসে যায় যে, শিরক হলো অনেক বড়ো অন্যায়। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করাই হলো শিরক। আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে শিরকের কোনো দিক লুকিয়ে আছে কি না, কারণ এটি অনেক বড়ো অন্যায়। বুখারীর তফসীরে হযরত ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ্ (রহ.) এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তিনি লিখেছেন,"اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (তথা নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড়ো যুলম)। যুলমের অর্থ হলো, وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهٖ অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে অনুপযুক্ত স্থানে রাখা। সব ধরনের অনৈতিক কথাবার্তা ও অবৈধ বিষয়াদি যুলমের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। **'কুফরুন দূনা কুফরিন'** শিরোনামের অধীনে শিরককে সবচেয়ে বড়ো কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সাধারণ দুশ্চরিত্রতাকেও কুফর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি হলো এর সূক্ষ্ম দিক। এরপর **'যুলমুন দূনা যুলমিন'** শিরোনামের অধীনে শিরককে মহা অন্যায় সাব্যস্ত করে বলেছেন, এটি কেন এত বড়ো পাপ। কারণ এতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ গুণাবলি, অর্থাৎ উলুহিয়্যত বা উপাস্য হবার বিশেষ গুণ অন্য কারো প্রতি আরোপ করা হয়; ইবাদত অর্থাৎ ভালোবাসা ও আনুগত্য– যা মূলত আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য– তাতে অন্যদের অংশীদার বানানো হয়। মানুষ– যে কি না তাঁর বান্দা এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এসেছিল– সে নিজের প্রবৃত্তির বা নিজের মতো অন্য কোনো মানুষের অথবা তুচ্ছ কোনো সত্তার দাসে পরিণত হয়ে নিজেকে সেই মর্যাদা থেকে অধঃপতিত করে, যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। হুকুকুল ইবাদ (তথা বান্দার প্রাপ্য অধিকার) অন্যায়ভাবে পদদলিত করা যেমন অন্যায়, এটিও একটি অন্যায়। হুকুকুল্লাহ্ (বা আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার)-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ এর চেয়েও অনেক বড়ো অন্যায়। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে যে অন্যায় করা হয়, তা তো হয়ই; কিন্তু আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকারগুলো যথাযথভাবে প্রদান না করাও অন্যায়। এটি যুলম বা অন্যায়ের মর্ম যা শিরকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। শিরক মূলত মানুষের চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভের বড়ো অন্তরায়। (কুরআনের) আয়াত

ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে ইমাম বুখারী (রহ.) এটি বুঝিয়েছেন যে, পরিপূর্ণ ঈমান হলো সেটি, যা শিরকের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (সূরা আল-আনআম :৮৩) (অর্থাৎ) **পূর্ণ নিরাপত্তা ও হিদায়াত এমন লোকদের জন্যই নির্ধারিত, যাদের ঈমানে কোনো প্রকার শিরক ও অন্যায়ের মিশ্রণ থাকে না**। ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না একদিকে এর সাথে সৎকর্ম থাকবে এবং অন্যদিকে তা সব ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে; কেননা শিরক, পাপ এবং সব ধরনের কুফর একে ত্রুটিপূর্ণ করতে থাকে।" **(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৯, নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত)**

কাজেই, এটি হলো তওহীদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং শিরক থেকে পবিত্রতা লাভের মানদণ্ড, যা মহানবী (সা.) আমাদের জানিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: **আল্লাহ্ তা'লা বলেন: আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এটি তার জন্য সমীচীন ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এটি তার জন্য সমীচীন ছিল না। আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি হলো তার একথা বলা যে, আমি তাকে কখনো পুনরায় সৃষ্টি করব না,** (অর্থাৎ, পারলৌকিক জীবনকে সে অস্বীকার করছে, আর এটি হলো আল্লাহ্‌কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা;) **ঠিক যেভাবে আমি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আমাকে গালি দেবার অর্থ হলো তার একথা বলা যে, তিনি এক পুত্রসন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি অমুখাপেক্ষী। আমি (কাউকে) জন্ম দেই নি এবং আমাকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। আর আমার কোনো সমকক্ষও নেই।** না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন, না তাঁকে জন্ম দেওয়া হয়েছে। **এবং তাঁর গুণাবলিতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই।** **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীরুল্ কুরআন, বাবু কওলিহী (اَللّٰهُ الصَّمَدُ), হাদীস নং: ৪৯৭৫)**

এই সূরা অর্থাৎ, সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اَللّٰهُ الصَّمَدُ। আল্লাহ্ সেই সত্তা, সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

তিনি (আ.) বলেন, "ভেবে দেখা উচিত, এই ছোট্ট সূরায়– যা এক লাইনের সমানও হবে না– কত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে সব ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাকে এটি সব ধরনের শিরক থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছে। এর বিশদ বিবরণ হলো, বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদারিত্ব চার প্রকার হয়ে থাকে। *যৌক্তিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, অংশীদারিত্ব বা শিরক চারভাবে হতে পারে।* কখনো অংশীদারিত্ব সংখ্যার নিরিখে হয়ে থাকে, *অর্থাৎ সংখ্যায় এক, দুই, তিন হওয়া;* কখনো মর্যাদার দিক থেকে হয়, *অর্থাৎ কারো মর্যাদা উন্নত হওয়া*; কখনো বংশগতভাবে হয়, *অর্থাৎ পারিবারিক ভাবে*; কখনো কর্ম ও প্রভাবের দিক থেকে হয় *অর্থাৎ কর্মের দিক থেকে এবং এর পরিণামের দৃষ্টিকোণ থেকে*। কাজেই, এই সূরায় খোদা তা'লাকে এই চার প্রকার অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র হবার ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি সংখ্যায় এক; দুই বা তিন নন। আর তিনি 'সামাদ', অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের মর্যাদা, তাঁর

অপরিহার্যতার মর্যাদা এবং অন্য সবার তাঁর মুখাপেক্ষী হবার দিক থেকে তিনি একক ও পবিত্র। *তাঁর যে মোকাম রয়েছে, তাঁর যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তাঁর কারো মুখাপেক্ষী না হবার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও অনন্য।* আর তিনি ব্যতীত বাকি সব কিছুই সম্ভাব্য সত্তা এবং নশ্বর সত্তা। *যা তাদের নিজ সত্তায় ধ্বংসশীল, শেষ হয়ে যাবার মতো; কিন্তু তিনি চিরঞ্জীব–চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন;* যারা সবসময় তাঁর মুখাপেক্ষী, *পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর, এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।* আর তিনি لَمْ يَلِدْ অর্থাৎ তাঁর কোনো পুত্র নেই, যে পুত্র হবার কারণে তাঁর অংশীদার হবে। আর তিনি وَلَمْ يُولَدْ অর্থাৎ তাঁর কোনো পিতা নেই, যে পিতা হবার কারণে তাঁর অংশীদার হবে। আর তিনি وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ তাঁর কর্মকাণ্ডে কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই, যে কর্মের নিরিখে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত হবে। এজন্যই এভাবে বলেছেন, খোদা তা'লা চার প্রকার শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকেই সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত এবং (তিনি) এক ও অদ্বিতীয়।" **(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১৮, টীকা পাদটীকার অবশিষ্টাংশ নাম্বার: ৩)**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে কোনো এক যুদ্ধভিযানে আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নামায পড়ানোর সময় তিলাওয়াতের পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করে তিলাওয়াত শেষ করতেন। অর্থাৎ শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। অভিযান থেকে ফিরে এসে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি (সা.) বলেন, **তাকে জিজ্ঞেস করো– সে কেন এমনটি করত?** তারা যখন তাকে জিজ্ঞেস করে তখন তিনি বলেন, **যেহেতু এটি রহমান আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্বলিত, তাই আমি এটি পড়তে ভালোবাসি।** তখন মহানবী (সা.) বলেন, **তাকে বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ভালোবাসেন।** এতে আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের ঘোষণা রয়েছে, তাই জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ও তোমাকে ভালোবাসেন। **[সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তওহীদ, বাবু মা জায়া ফী দুআ'ইন নবীয়্যী (সা.) উম্মাতাহূ ইলা তওহীদিল্লাহ্; হাদীস নং: ৭৩৭৫]**

সাহাবী (রা.)-দের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং তওহীদের প্রতি অনুরাগের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায়।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, আনসারের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মসজিদে কুবায় তাদের ইমামতি করতেন। তিনি যখনই নামাযে কোনো সূরা পড়তেন, তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দিয়ে শুরু করতেন এবং সেটি শেষ করে তারপর অন্য সূরা পড়তেন। তিনি এটি প্রতি রাকাতেই করতেন। প্রথম ঘটনাটি ছিল, কোনো অভিযানে অংশ নেওয়া কাফেলার, আর এটি ছিল একটি এলাকার স্থানীয় ইমামের স্থায়ী রীতি। তার সাথিরা যখন তার সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন, তুমি এই সূরাটি পড়ো আর মনে করো যে, এটি তোমার জন্য যথেষ্ট নয় আর একারণে তুমি এর সাথে অন্য আরেকটি সূরা পড়ো। হয় তুমি শুধু এটিই (সূরা ইখলাস) পড়ো, নয়তো এটি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো সূরা পড়ো। তিনি বলেন, আমি এটি ছাড়ছি না। তোমরা যদি চাও আমি যেভাবে পড়ছি সেভাবেই তোমাদের ইমামতি করি তাহলে আমি করব, আর যদি তোমরা আমার এই সূরা পড়া

অপছন্দ করো তবে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি, আমার ইমামতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তাকে নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মনে করত আর তারা চাইত না– তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইমামতি করুক। যাহোক, যখন মহানবী (সা.) তাদের কাছে আসেন তখন তারা তাঁকে (সা.) এ বিষয়টি অবহিত করেন যে, এই ব্যক্তি প্রতি রাকাতে এবং প্রত্যেক সূরার আগে সূরা ইখলাস পাঠ করেন। তিনি (সা.) বলেন, **হে অমুক! তোমার সাথিরা যা বলছে তা করতে তোমাকে কীসে বাধা দিচ্ছে? আর কোন্ জিনিস তোমাকে প্রতি রাকাতে এই সূরাটি পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করছে?** তিনি (রা.) বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এই সূরাকে ভালোবাসি।** তখন মহানবী (সা.) বলেন, **নিশ্চয় এর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে গিয়েছে।** অর্থাৎ সূরা ইখলাসের প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। **(জামে তিরমিযী, কিতাবঃ ফাযাইলিল্ কুরআন, বাবঃ মা জায়া ফী সূরাতিল্ ইখলাস, হাদীস নংঃ ২৯০১)**

মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি এবং তরবিয়ত সাহাবীদেরকেও তওহীদের পথ প্রদর্শনের আলোকবর্তিকা বানিয়ে দিয়েছিল। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই সূরাটিকে মহানবী (সা.) 'সুলুসুল্ কুরআন' বা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ আখ্যা দিয়েছেন। এর তফসীরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, "এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হবার অর্থ এটি নয় যে, এটি আয়তনে কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ; বরং এর অর্থ হলো এর বিষয়বস্তু বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কুরআন ও হাদীস পাঠে জানা যায়, শেষ যুগে দুটি বড়ো নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেবার কথা– একটি দাজ্জালের নৈরাজ্য এবং অন্যটি ইয়াজুজ ও মাজুজের ফিতনা। আর এই উভয় ফিতনা একের পর এক ইসলামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার কথা। একটি ফিতনা এক খোদার পরিবর্তে তিন খোদার বিশ্বাস রাখে, অর্থাৎ ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র ও পবিত্র আত্মা। আর অন্যটি হলো নাস্তিকতা, যারা খোদাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। পবিত্র কুরআন এই উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই খণ্ডন করেছে এবং সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপন করেছে। কুরআন 'পিতা ঈশ্বর'-এর কথায় পরিপূর্ণ এবং একইভাবে তাঁর প্রতিপালক হওয়া এবং এক-অদ্বিতীয় হবার কথা সমর্থন করে, অর্থাৎ এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং তাঁর এক হবার সমর্থন করে। আর অন্যদিকে রূহুল কুদুস খোদা ও পুত্র খোদার ধারণাকে পূর্ণরূপে খণ্ডন করে। আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনো খোদার ধারণাকে প্রত্যাখান করেন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন পিতা খোদার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পুত্র ও পবিত্র আত্মার খোদা হবার ধারণাকে খণ্ডন করেছে। তাই এটি পরিষ্কার বিষয় যে, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ যেহেতু পিতা খোদার বর্ণনা সংবলিত তাই সূরা ইখলাসও কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। **প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের কাজ হলো তওহীদকে প্রমাণ করা এবং ভ্রান্ত আকীদাকে নির্মূল করা। অতএব, যখন এই সূরাটি পূর্ণাঙ্গরূপে অথচ অতি সংক্ষেপে সেই বিষয় তুলে ধরেছে যার মাধ্যমে ভ্রান্ত আকীদা মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং তওহীদের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়, তাই এই সূরাটি কেবল এক-তৃতীয়াংশই নয় বরং পুরো কুরআনের সমতুল্য হয়ে গেল। অতএব, মহানবী (সা.)-এর এই সূরাটিকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা কোনো অতিরঞ্জন নয়, বরং এর বিষয়বস্তুর গুরুত্বের নিরিখেই তিনি এমনটি বলেছেন।"** **(তফসীরে কবীর, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩, নব সংস্করণ)**

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"মনে রেখো! নিশ্চয় সুনিশ্চিত তওহীদ কেবল নবীর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। যেমনটি আমাদের নবী (সা.) আরবের নাস্তিক ও ধর্মহীনদের হাজার হাজার স্বর্গীয় নিদর্শন দেখিয়ে খোদার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়েছেন। অদ্যাবধি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত ও পূর্ণরূপে অনুসরণকারীরা সেই নিদর্শনগুলো নাস্তিকদের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে। সত্য কথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি প্রত্যক্ষ না করে, ততক্ষণ শয়তান তার অন্তর থেকে বের হয় না। আর তার অন্তরে প্রকৃত তওহীদ প্রবেশ করে না আর সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসও স্থাপন করতে পারে না। আর এই পবিত্র ও পূর্ণ তওহীদ কেবল মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ হয়।"** (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ১২১)

এ যুগে যারা খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মানার দাবি করে, তারাও কার্যত তওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের নৈরাজ্য একটি বহিরাগত বিষয়, সেগুলো বাইরের ফিতনা। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবেও মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত তওহীদের উপলব্ধি হারিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.)-এর দাস মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে আগমনের কথা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি এসেছেন এবং তওহীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন।

অতএব, প্রকৃত বয়আতের শর্ত তখনই আমরা পালন করতে সক্ষম হবো যখন আমরা প্রকৃত অর্থে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ২৩শে মার্চ তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মার্চ মাসই আমরা এখন অতিবাহিত করছি এবং ২৩শে মার্চের নিরিখে আমরা 'মসীহ্ মওউদ দিবস'-এর জলসাও এ উদ্দেশ্যেই করি। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর দাসকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা তাঁর হাতে বয়আত করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরাও সর্বদা তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। প্রকৃত অর্থে তখনই আমরা একত্ববাদী হতে সক্ষম হবো যখন আমরা প্রত্যেকে নিজের মাঝে, নিজেদের পরিবারে এবং সমাজে তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা সকল মুসলমানকেও তৌফিক দিন যেন তারা আল্লাহ্‌র এই প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করে তওহীদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালী নৈরাজ্যসমূহের মোকাবিলা করে, যারা আজ অত্যন্ত তীব্রভাবে হামলা করছে।

মহানবী (সা.)-এর 'ইসরার' বরাতে একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সে রাতে সাক্ষাৎ করি যে রাতে আমার ইসরার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতকে সালাম পৌঁছে দিন এবং তাদের জানিয়ে দিন, জান্নাত পবিত্র মাটি, সুমিষ্ট পানি ও বিস্তৃত ভূমিবিশিষ্ট। এর তরুলতাসমূহ হলো **সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর**। (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাবঃ ৫৯, হাদীস নং ৩৪৬২)

অতএব, একজন মু'মিনের এসব যিক্‌র এমনই গভীরতা সহকারে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ অনুধাবন করে করা উচিত, তবেই সফলতা লাভ হবে। আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করি।

একটি রেওয়ায়েতে এই হাদীসে কুদসীটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে যে দোয়া করেছ এবং আমার কাছে প্রত্যাশা রেখেছ (সে মোতাবেক) তোমার মাঝে যা আছে তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি; আর আমি কোনো ভ্রুক্ষেপ করি না।** অর্থাৎ, এখনো তোমাদের মাঝে দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকবে, কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি; কেননা তুমি আমার কাছে দোয়া করছ। **হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপ আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো আর আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। যত পাপই হোক না কেন আমি ক্ষমা করার সময় ভ্রুক্ষেপ করি না।** আল্লাহ্ তা'লা মালিক (সর্বাধিপতি), তিনি ক্ষমা করতে পারেন। তিনি (আল্লাহ্) বলেন, **হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম পাপ নিয়েও আমার কাছে আসো আর তুমি আমার সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হও যে, আমার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো নি, তাহলে আমি এর অনুরূপ ক্ষমায় তোমাকে ধন্য করবো।** পৃথিবীসম পাপও যদি করে থাকো কিন্তু যদি শিরক না করে থাকো এবং আমার প্রতি ভয় থাকে এবং আমার তওহীদের ঘোষণা করে থাকো এবং পুণ্য করার চেষ্টা করে থাকো, তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। **(জামে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, হাদীস নং ৩৫৪০)**

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সকল ভুলত্রুটি, সকল পাপ ক্ষমা করে দেন, যখন মানুষ তাঁর কাছে বিনয়ী হয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু শর্ত হলো শিরক না করা। প্রকৃত অর্থে একত্ববাদী হওয়া আবশ্যক। যেমনটি আমি পূর্বের দৃষ্টান্তে বলেছি– শুধু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। কার্যত নিজের প্রতিটি কাজ দ্বারা সাব্যস্ত করতে হবে– খোদা তা'লা এক-অদ্বিতীয়।

একইভাবে তওহীদের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেছিলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে কোনো এমন বিষয় শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি তোমার যিকরও করব এবং তোমার কাছে দোয়াও করব। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মূসা! বলো, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**। হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেন, হে আমার খোদা! তোমার সকল বান্দা এটিই বলে। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেন, বলো, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**। হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমি তো এমন কোনো কিছু শিখতে চাই যা বিশেষভাবে আমার জন্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মূসা! আমি ব্যতীত বাকি সাত আকাশ ও এর অধিবাসীদের যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-কে অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এই সবকিছুর চেয়ে ভারি হবে। **অর্থাৎ, আকাশ**

ও পৃথিবীতে বিরাজমান বস্তুনিচয় আর এর যত বসতি রয়েছে, যত পুণ্য রয়েছে; এই সবকিছুকে একদিকে রেখে দাও এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-কে আরেক দিকে রেখে দাও; তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-র পাল্লা ভারি হবে। (আল-মুস্তাদরাক আলাস্ সহীহাঈন, কিতাবুদ দুআ... ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১০, হাদীস নংঃ ১৯৩৬, দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যাহ্)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি আপত্তির উত্তরে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** কলেমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'**। এটি পাঠ করলে পাপ দূরীভূত হয়; এটি একেবারে সঠিক কথা। আর এটিই প্রকৃত সত্য কথা, যে ব্যক্তি শতভাগ আল্লাহ্ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে আর বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সেই সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্ই প্রেরণ করেছেন– তবে যদি তার জীবনাবসান এই কলেমায় বিশ্বাসরত অবস্থায় হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে মুক্তি লাভ করবে। আকাশের নীচে বা ধরাপৃষ্ঠে কারো আত্মহত্যার মাধ্যমে কখনো মুক্তি লাভ হয় না। সে ব্যক্তির চেয়ে বড়ো উম্মাদ আর কে হতে পারে, যে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে? পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান করা এবং তাঁকে এমন পরম দয়ালু জ্ঞান করা যে, তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে জগদ্বাসীকে পথভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রিয় রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাঁর পবিত্র নাম হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.); এটি এমন এক আকীদা যাতে বিশ্বাসের দরুন মানুষের অন্তরের অমানিশা দূর হয়ে যায় আর প্রবৃত্তির অবাধ্যতা দূরীভূত হয়ে তওহীদ সেই স্থানটি নিয়ে নেয়। অবশেষে তওহীদের শক্তিশালী প্রভাব সমগ্র হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে এবং এ জগতেই এক জান্নাতী জীবন শুরু হয়ে যায়। যেমনটি তোমরা প্রত্যক্ষ করে থাকো, আলো আসলে অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না, তেমনই অন্তরে যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-র জ্যোতির্মণ্ডিত প্রতিফলন ঘটে তখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অমানিশা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাপের প্রকৃত স্বরূপ হলো, দুষ্কৃতির সংমিশ্রণে প্রবৃত্তিগত কামনা-বাসনার সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়; অর্থাৎ আত্মিক কামনা-বাসনা ফুঁসে ওঠে; যার অনুসরণে কোনো এক ব্যক্তির নাম পাপী রাখা হয়। (যখন কোনো ব্যক্তি পুণ্যের বিপরীত কাজ করে তখনই সে পাপী সাব্যস্ত হয়।) আরবী ভাষার আলোকে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-র অর্থ হচ্ছে– 'লা মাতলূবা লী, ওয়ালা মাহবূবা লী, ওয়ালা মা'বূদা লী, ওয়ালা মুতা'আ লী ইল্লাল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো প্রেমাস্পদ নেই, কোনো উপাস্য নেই এবং কোনো অনুসরণীয় নেই যাকে আমি অনুসরণ করব। স্পষ্টতই, এই অর্থ পাপের প্রকৃত মর্ম ও পাপের উৎস হতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই অর্থগুলোকে নিজের অন্তরে স্থান দেবে তখন নিশ্চিতভাবেই এর বিপরীত ধারণা তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে। ভিন্ন কোনো বিষয় তার অন্তরে স্থান পাবে না; *একথাটি প্রণিধানযোগ্য;* কারণ তখন সে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির অনুসরণ করবে এবং প্রকৃত তওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে। কেননা, পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। অতএব, প্রবৃত্তির বাসনা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত পবিত্রতা ও সত্যিকার সততা বলা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের প্রতি ঈমান আনয়ন করা কলেমার

দ্বিতীয়াংশ। আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রেও এর আবশ্যকতা রয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি এটি স্বীকার করে যে, আমি আল্লাহ্‌র অনুগত হতে চাই, তার জন্য তাঁর নির্দেশসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। আর সেই নির্দেশসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর নয়, যদি না সে সেই প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। তার (তথা প্রেরিত ব্যক্তির) প্রতি ঈমান আনাও আবশ্যক। অতএব, এটিই কলেমার প্রকৃত তাৎপর্য।" **(নূরুল কুরআন, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮-৪২০)**

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, **শিরক থেকে বিরত থাকো, কারণ এটি পিঁপড়ার সূক্ষ্ম পদচিহ্নের চেয়েও সূক্ষ্ম।** তখন একজন জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কীভাবে এর থেকে রক্ষা পেতে পারি, যেক্ষেত্রে তা পিঁপড়ার পদচিহ্নের চেয়েও সূক্ষ্ম? তিনি (সা.) বলেন, তুমি এই দোয়াটি পাঠ করো, اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ অর্থাৎ, **হে আল্লাহ্! আমরা সজ্ঞানে তোমার সাথে কাউকে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আর যা অজান্তে হয়ে যায় তার জন্যও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।** সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কৃপাভিক্ষা চাইতে থাকো। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬১৪-৬১৫, মুসনাদ আবু মূসা আল-আশআরী, হাদীস নং: ১৯৮৩৫, বৈরুতের আলমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবদুর রহমান বিন আবযা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) প্রত্যুষে এই দোয়া পাঠ করতেন:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ইসলামের প্রকৃতি, খাঁটি একত্ববাদের কলেমায় এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের ওপর ও আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতে অধিষ্ঠিত থেকে আমাদের সকাল হলো, যিনি একেশ্বরবাদী মুসলমান ছিলেন আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সকালে জাগ্রত হয়েই প্রথমে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করো। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪-২৯৫, মুসনাদ আব্দুর রহমান বিন আবযা, হাদীস নং: ১৫৪৩৪, বৈরুতের আলমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সন্ধ্যা হতো তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন:

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه

আমরা এবং সমস্ত বিশ্ব আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয্ যিকর ওয়াদ্ দুয়া, বাবু আত-তাআউযু মিন শাররি মা আমিলা ওয়া মিন শাররি মা লাম ইয়ামাল, হাদীস নং: ২৭২৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন বুরাইদা আসলামী তার পিতার বরাতে বলেন, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একথা বলে দোয়া করতে শোনেন, **হে আল্লাহ্! আমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই আল্লাহ্। তুমি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তুমি এক ও অদ্বিতীয়, তুমি অমুখাপেক্ষী। তুমি কাউকে জন্ম দাও নি আর তোমাকেও জন্ম দেওয়া হয় নি এবং তোমার সমতুল্য কেউ নেই**। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এটি শুনে বলেন, **সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহ্র সমীপে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নামের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করেছে; এর মাধ্যমে যখনই প্রার্থনা করা হয় তিনি তা কবুল করেন, আর যখন এর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া হয় তখন তিনি তা দান করে থাকেন**। (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাবু মা জায়া ফী জামিউদ্ দাওয়াতি আন্ রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস নং: ৩৪৭৫)

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, **আমি কি তোমাকে এমন কিছু শব্দ শেখাবো না, যা তুমি কাঠিন্য ও বিপদের সময় পাঠ করতে পারো? সেই শব্দমালা হলো–** اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا আল্লাহ্! আল্লাহ্ আমার প্রভু; আমি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল্ বিতর, বাবু ফিল্ ইস্তিগফার, হাদীস নং: ১৫২৫)

বিপদের সময় কী পাঠ করতে হবে– লোকেরা তা জিজ্ঞেস করে; এমন পরিস্থিতিতে পঠনীয় দোয়াগুলোর মাঝে এটিও একটি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বিচলিত অবস্থায় এবং উৎকণ্ঠার সময় এভাবে দোয়া করতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সেই আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই যিনি অতীব মহান ও সহনশীল। স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাবু আদ-দুয়াউ ইনদাল কারবি, হাদীস নং: ৬৩৪৫)

কত সূক্ষ্মভাবে মহানবী (সা.) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিতেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু রিমসা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে আপনার সেই জিনিসটি দেখান যা আপনার পিঠে রয়েছে, অর্থাৎ নবুয়্যতের মোহর, কেননা আমি একজন চিকিৎসক। তিনি (সা.) বলেন, **চিকিৎসক তো আল্লাহ্, বরং তুমি একজন সুহৃৎ যে অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকো ও আশ্বস্ত করো। চিকিৎসক তো তিনি যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আরোগ্যদাতা**। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুত্ তারাজ্জুল, বাবু ফিল্ খিযাব, হাদীস নং: ৪২০৭), (আওনুল মা'বুদ, ১১তম খণ্ড, পৃ: ১৭৫, কিতাবুত্ তারাজ্জুল, বাব: ১৭, হাদীস নং: ৪২০১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি বলে– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল এবং হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও তাঁর দাসীর পুত্র আর তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের প্রতি ফুৎকার করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ; আর জান্নাত সত্য এবং**

জাহান্নামও সত্য– আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যে দ্বারপথে চাইবেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

উমায়ের বিন হানী একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সত্যায়ন করেছেন। তবে তিনি বলেন, **'তার আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন'**, এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তিনি (সা.) একথা বলেন নি যে, **'আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যে দ্বারপথে চাইবেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'**। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদ-দালীলু আলা মান মাতা আলাত-তওহীদি দাখালাল জান্নাহ্, হাদীস নংঃ ২৮)**

হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হলো, আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সব কিছুর উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আরকানিল ইসলামি... হাদীস নংঃ ১৬।)**

মুহাজির নারী হযরত ইয়াসইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **তোমাদের নারীদের জন্য আবশ্যক হলো– আল্লাহ্র তসবীহ্, তাহলীল ও তাকদীস করা এবং আলস্য না করা, নতুবা তোমরা তওহীদকে ভুলে যাবে। আর আঙুলে গণনা করো, কারণ নিশ্চয়ই আঙুলগুলো কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং সেগুলোকে কথা বলার জন্য বলা হবে;** অর্থাৎ গুণে গুণেও আল্লাহ্র যিকর করো, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করো, আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনা করো, তাঁর তসবীহ্ করো। **(আল-মুস্তাদরাক আলাস্ সহীহাঈন, কিতাবুদ দুয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩২, হাদীস নংঃ ২০০৭, দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

অতএব, মহানবী (সা.) কোনো সুযোগে, কোনো সমাবেশে, কোনো শ্রেণির মধ্যে এ বিষয়টি উম্মতের অন্তরে বদ্ধমূল করার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। অর্থাৎ, যেখানেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার একত্ব এবং তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেবার সুযোগ পেয়েছেন তা কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, বরং খুতবাতেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.)-এর এ বিষয়ে এমন প্রবল উদ্দীপনা ছিল যে, তাঁর বিরোধীরাও এ কথা স্বীকার করে, তিনি (সা.) উঠতে-বসতে, চলাফেরায় সর্বক্ষণ খোদা তা'লার নামই জপতেন। ফ্রান্সের একজন ইতিহাসবিদ (Alphonse de Lamartine) লিখেছে, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আর যে-কোনো অভিযোগই আরোপ করা হোক না কেন, আমার দৃষ্টিতে তাঁর *অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর* মাঝে এমন একটি বিষয় বিদ্যমান ছিল যা পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কোনো ব্যক্তির মধ্যে তা দেখা যায় নি। *এটি এমন একটি বিষয় যা আমি কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখি নি।* আর তা হলো, যখন থেকে তিনি নবুয়্যতের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মুখে একটি শব্দই ছিল, আর সেই শব্দটি ছিল 'আল্লাহ্'। যেন তাঁর একটি নেশা ছিল এবং এক ধরনের উন্মাদনা ছিল যে, আল্লাহ্র অস্তিত্বে মানুষকে বিশ্বাস করাতে হবে এবং তাঁকে পৃথিবীতে প্রকাশ করতে হবে।

অতএব, যারা মহানবী (সা.)-এর এই কাজকে অর্থাৎ সর্বক্ষণ খোদা তা'লার নাম জপতে থাকাকে উম্মাদনা মনে করে, তারাও এ কথা স্বীকার করে যে, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বড়ো এবং প্রথম কাজ ছিল আল্লাহ্‌কে এবং আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্বকে মানানো। এটি উন্মাদনা হলেও, এটি এমন এক বিষয় যে, এই উন্মাদনার শিকার ব্যক্তিকেই পরবর্তীকালের মানুষ কামিল জ্ঞান করেছে; আর যদি কামিল বা পূর্ণাঙ্গ না-ও মনে করে, তবে অন্তত এতটুকু তো বিশ্বাস করেছে যে, এমন ব্যক্তি খারাপ হতে পারে না, যিনি দিনরাত 'খোদা খোদা' করতে থাকেন এবং তাঁর একত্ব ও তাঁর গুণাবলি মানানোর চেষ্টায় সর্বক্ষণ লেগে থাকেন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থাকে দেখে এটিই মনে হয় যে, তাঁর (সা.) এবং সকল নবীর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই হলো শিরক দূর করা এবং খোদা তা'লাকে মানানো, তাঁর একত্বকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করা। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০-২৬১)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এটিও লিখেছেন যে, এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা যতই উচ্চ হোক এবং তাঁর প্রতি আমাদের যতই ভালোবাসা থাকুক, আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা সর্বাবস্থায় তাঁর মর্যাদার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'লা অনাদি ও অনন্ত, আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) হলেন তাঁর অসংখ্য কৃপারাজির মাঝে অনেক বড়ো এক কল্যাণ। এটি তাঁর সত্তার সাথে শত্রুতা পোষণ করার নামান্তর হবে যদি আমরা তাঁকে এমন কোনো মর্যাদা দিয়ে বসি, যা দেবার ফলে খোদা তা'লার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় বা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কারণ মহানবী (সা.) নিজেও কখনও এটি পছন্দ করতেন না যে, তাঁকে খোদা তা'লার চেয়ে বড়ো মর্যাদা দেওয়া হবে, যেমনটি আমি পূর্বে হাদীসগুলোতে বর্ণনা করেছি। আর তাঁর প্রতিটি কাজ এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। তিনি যে-সব বড়ো বড়ো কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেগুলো করার জন্য অত্যন্ত প্রবল শক্তির প্রয়োজন ছিল, যা ছিল কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। এগুলো কেবল আল্লাহ্ তা'লার শক্তিতেই সম্ভব ছিল। কোনো শক্তিশালী মানুষও এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু তিনিও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন আর সে সময় চরম কষ্ট হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আগে মনে করতাম– যার মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি হয় সে ভালো মানুষ হয় না। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যার কষ্ট বেশি হয় সেটি একথার প্রমাণ যে, সে ভালো মানুষ নয়। কিন্তু যখন আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তখন আমাকে আমার মত পরিবর্তন করতে হলো। সেই চরম কষ্টের সময়েও তিনি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যেহেতু জানতেন, তাঁর প্রতি তাঁর অনুসারীদের এত গভীর ভালোবাসা রয়েছে, যে কারণে হতে পারে তারা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবে, অতিরঞ্জন করবে; তাই সেই কষ্টের সময় বার বার তাঁর মুখ থেকে একথাগুলো বের হয় যে, **আল্লাহ্ তা'লা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে।** তিনি বার বার এটিই বলছিলেন, যেন **জাতিকে দেওয়া তাঁর শেষ উপদেশ এবং শেষ শিক্ষা এটিই ছিল যে, আমাকে এমন মর্যাদা দিও না যা শিরকসুলভ; আর যদি তোমরা তা করো তবে এটা মনে কোরো না যে, আমি এতে সন্তুষ্ট হবো; বরং আমার আত্মা এমনটি যারা করে তাদের অভিশাপ দেবে।**

অতএব, যদি মহানবী (সা.)ও হন, তাঁর প্রতিও এমন কোনো মর্যাদা আরোপ করা যা আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদাকে খর্ব করার নামান্তর– তা তাঁর জন্য আনন্দের কারণ নয়; বরং এমন ব্যক্তির প্রতি তাঁর অভিশাপ বর্ষিত হয়, আর মৃত্যুকালের অভিশাপ তো অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে থাকে। যারা সত্য ধর্মের অনুসারী নয়, যেমন হিন্দুরা, তারাও মৃত্যুকালের অভিশাপকে খুব ভয় করে। মা-বাবার মৃত্যুর সময়ে দেওয়া অভিশাপকেও মানুষ ভয় করে। তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন মৃত্যুর সময় এই বদদোয়া করেন যে, **'তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত'**; যিনি সকল নবীর নেতা– তিনি যদি মৃত্যুর সময় এই বদদোয়া করেন– তাহলে এর গুরুত্ব কত বেশি হওয়া উচিত এবং এটি কত বড়ো অভিশাপ! এ থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর সমাধিতে না হলেও, যেমনটি আমি পূর্বেও একবার বলেছি, পীর-ফকিরদের মাজারগুলোতে এই অপকর্ম করা হয়, আর মহানবী (সা.)-এর দোয়ায় এমন কাজের বিরুদ্ধে অভিশাপ বিদ্যমান। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৬০০-৬০১ থেকে সংগৃহীত)**

অতএব, আমরা যারা তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাসের অনুসারী, আমাদের এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, আমরা যেন তওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে, মহানবী (সা.)-এর তওহীদ প্রতিষ্ঠার সেই বেদনা অনুধাবন করে, এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে প্রকৃত একত্ববাদের অনুসারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

যুদ্ধের পরিস্থিতিও ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং ইসরাঈল সমগ্র বিশ্বে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় রত। যেমনটি ফিলিস্তিনে প্রথমবার আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করার সময় ইসরাঈলের রাষ্ট্রপতি বলেছিল, এখন এই অঞ্চলের বরং আরব দেশগুলোর মানচিত্রও বদলে দেওয়া হবে। অতএব, এগুলো মানচিত্র বদলে দেবারই অপপ্রয়াস। মুসলিম বিশ্বের অন্তত এখনও অনুধাবন করা উচিত যে, এরা কোন্ দিকে এগোচ্ছে; মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তান নাকি ইরান এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকার বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা করছে। যেহেতু মাঝখান থেকে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আরব দেশগুলোর, তাই পাকিস্তান এ দৃষ্টিকোণ থেকে চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে ইরানের কিছু মহলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, এটি ঠিক নয়। এমনকি তারা এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে; ইরানের কিছু মহলে, শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে বা বিশ্লেষকরা বলছে, ইরান সংলগ্ন সীমান্তে নাকি পাকিস্তান নিজ ভূখণ্ডে মার্কিন সেনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সাহায্য করছে, অথবা এমন লোকদের সাহায্য করছে যারা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। যাহোক, এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। **শত্রু এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায়, যেন মুসলিম দেশগুলো কখনো একে অপরের সাহায্যকারী হতে না পারে। তাই অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দিক থেকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং ইসলামী দেশগুলোকে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত হবার তৌফিক দিন।**

(সূত্র: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ এপ্রিল ২০২৬, পৃ: ১-৮)